সুখ-অসুখ

BANGLADARSHAN.COM

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

॥সুখ-অসুখ॥

মনোরঞ্জন নাকি হঠাৎ অসুস্থ হে পড়েছে। পরেশই আমাকে খবরটা দিল। কী একটা কাজে সে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিল। ফাইল সই করাতে, নাকি বিল পাশ করাতে। গিয়ে দেখে এসেছে চক্রবর্তী সাহেব চেয়ারে এলিয়ে পড়ে আছেন। গলার টাই আলগা করে দেওয়া হয়েছে। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। তাও গলগল করে ঘামছেন। সকলেই বলাবলি করছে, হার্ট।

মনোরঞ্জন আমার বন্ধু। একসঙ্গেই অফিসের গাড়িতে একটু আগে অফিসে এসেছি দুজনে। আসার সময়ে তাকে খারাপ দেখিনি। রোজকার মতোই হাসছিল, গল্প করছিল। হঠাৎ কী হল, কে জানে? আমার ডিমার্টমেন্ট তিন তলায়, মনোরঞ্জনের চার তলায়। মনোরঞ্জন আমাদের কোম্পানির চিফ অ্যাকাউট্যান্ট। বিলেত থেকে সি-এ করে এসেছে। স্বাস্থ্যও বেশ ভাল।

তাড়াতাড়ি গেলুম চারতলায় তার ঘরে। ঘষা কাচের দরজায় বাইরে ছোটখাটো একটা জটলা তৈরি হয়েছে। ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য সবাই খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। সাহেব অসুস্থ। একটা কিছু করা দরকার। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লুম। ঘরও খালি নেই। দু-চারজন সিনিয়র অফিসার খবর শুনেই ছুটে এসেছেন। একজন দেখলুম প্রাণপণে টেলিফোন করার চেষ্টা করছেন। কোথায় করতে চাইছেন বোঝা গেল না।

BANGLADARSHAN.COM

মনোরঞ্জন বিন বিন করে ঘামছে। ওর ঘরে একটা কুলার লাগানো ছিল। কে যেন বলেছিল কুলার শরীরের পক্ষে খারাপ। মনোরঞ্জন সেই কথা শুনে পরের দিনই কুলারটা খুলিয়ে ঘরে পাখার ব্যবস্থা করেছিল। মনোরঞ্জনের চোখ আধ-খোলা। মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, বেশ কষ্ট হচ্ছে। হয় শ্বাস নিতে, না হয় শ্বাস ছাড়তে। সারা মুখটা কেমন কালছে হয়ে উঠেছে। কোম্পানির ডাক্তার এসে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'অবিলম্বে নার্সিং হোমে ট্রান্সফার করুন। আমার খুব ভাল মনে হচ্ছে না।'

আমি মনোরঞ্জনের মুখের খুব কাছাকাছি এসে জিগ্যেস করলুম, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে নাকি তোমার?

এ প্রশ্ন করার অবশ্য কোনও মানে হয় না। প্রশ্নের জন্যেই প্রশ্ন। চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, লোকটা ক্রমশই এলিয়ে পড়ছে। ডাক্তার একটু মৃদু ধমক দিলেন, কেন অনর্থক ভিড় করছেন আপনারা? এঁকে এখুনি নার্সিংহোমে রিমুভ করুন আপনারা।

এতক্ষণ যে ভদ্রলোক টেলিফোন কসরত করছিলেন, তিনি ফোন নামিয়ে খুব গম্ভীর গলায় বললেন, না! ওঁর স্ত্রীকে পাওয়া গেল না। স্কুলে নেই। কোথায় যেন বেরিয়েছেন। আমি মেসেজ রেখে দিয়েছি। এলেই পেয়ে যাবেন। হঠাৎ আমার মনে হল, মনোরঞ্জন যদিও আমার বন্ধু, আমার কিন্তু এখন এই মুহূর্তে তার জন্যে কিছুই করার নেই। প্রথমত, ঘরে ভিড় না করাই ভাল। দ্বিতীয়ত, কেউ না কেউ তাকে এখনই স্ট্রেচারে চাপিয়ে, অ্যাম্বুলেন্সে করে, কোম্পানির বিরাট নার্সিংহোমে নিয়ে যাবে। তারপর সেখানে যমে মানুষে খেলা চলবে?

এমনকি এই মুহূর্তে মনোরঞ্জনেরও কিছু করার নেই। ওই চেয়ারে শরীরটাকে এলিয়ে রাখা ছাড়া ওর পক্ষে আর কিছুই করা সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে, চেয়ারে আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সোজা ওই নোংরা কার্পেটেই নেমে আসবে? দামি স্যুটফুটের মায়া ছেড়ে? অথচ আমি জানি ওর মতো শৌখিন খুঁতখুঁতে লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

বহুক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয়নি। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খাওয়া যায়। মনোরঞ্জন অসুস্থ বলে পৃথিবীর সব কাজ তো আর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। এই তো এত বড় অফিস, মনোরঞ্জনের পজিশনও তো কিছু কম নয়, চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট বলে কথা। অফিসের সকলেরই টিকি বাঁধা তার কাছে। কিন্তু কজন সহকর্মী এসেছেন এই ভীষণ মুহূর্তে? মনোরঞ্জনের দেহের ওপর এই যে জীবন-মৃত্যুর খেলা চলেছে, তাতে কার কী এসে যাচ্ছে? তার বউই বা কী করছে এই মুহূর্তে? কে বলতে পারে। বিলেত ফেরত আধুনিক মেয়ে। ববছাঁট চুল। একটা কিন্ডার গার্টেন স্কুল চালায়। সাহেব পাড়ায়। কোথায় কোন রেস্তরাঁয় গিয়ে বসে আছে পার্ক স্ট্রিটে। সঙ্গে কে আছে তাই বা কে জানে? এ দিকে স্বামী যায় যায়। অনিমেষ ফোন করছিল ভদ্রমহিলাকে দুঃসংবাদটা দেওয়ার জন্যে। অনিমেষের চালচলন কী খুব একটা স্বাভাবিক ছিল। ছিল না। যেন একটু বেশিমাত্রায় গম্ভীর। একটু লোক দেখানোর ভাব ছিল। আসলে মনোরঞ্জন যদি মারা যায়, এই অফিসে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে অনিমেষ। চট করে দু বছরের মধ্যেই চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে বসবে। মনোরঞ্জনের বয়েস এখন কিছু বেশি নয়। চাকরিও খুব বেশি দিনের নয়। একবারের টপে এসে বসেছে। সাধারণভাবে রিটায়ার করতে, কী ফিনানসিয়াল কন্ট্রোলারের পোস্টে প্রোমোশন পেতে বেশ সময় লাগত। ততদিন অনিমেষকে হা-পিত্যেশ করে করে বসে থাকতে হতো। স্কুটারের পেছনে ইয়া স্বাস্থ্য, সেই পাঞ্জাবি বউকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যেত। এখন গাড়ি কিনবে। স্ট্যাটাস আরও বাড়বে। বউকে আরও সুখে রাখতে পারবে। চেহারার জলুস আরও খুলবে। ত্বক আরও টানটান হবে। নির্ঝঞ্ঝাটে বংশ বৃদ্ধি করবে অর্থাৎ একজনের মৃত্যু আর একজনের অসীম সুখের কারণ হবে।

BANGLADARSHAN.COM

স্ট্রেচার এসে গেল।

সাদা ধবধবে। তার মানে অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে অফিসের সামনে। ঘষা কাচের দরজাটা একজন দু হাতে ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইল। স্ট্রেচার ঢুকবে বেরোবে। মনোরঞ্জন শুয়ে আছে স্ট্রেচারে। ঘাড়টা একদিকে কাত হয়ে আছে। হাত দুটো দেহের দু পাশে ছড়ানো। অনেক আগে। আমি যখন যোগাসন করতুম তখন এইভাবে শবাসনে শব হতুম। স্ট্রেচারের পেছন পেছন অনিমেষ ও আরও কয়েকজন এগিয়ে চলল। বোধহয় নার্সিংহোম পর্যন্ত যাবে ওদের মধ্যে একজনকে আমি জানি যার কাছে থেকে মনোরঞ্জন অনেক টাকা পাবে। মেয়ের বিয়ের সময় ধার করেছিল দু-তিন বছর আগে।

সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

একেবারে শেষ করে, টুকরোটা টুসকি মেরে চারতলা থেকে নীচের রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে নীচে নামব। মনোরঞ্জনের ব্যাপারে আপাতত আমার আর কোনও ভূমিকা নেই। অনেক উপকারী জুটে গেছে। ভিড় বাড়িয়ে লাভ নেই। বরং সময় নষ্ট না করে হাতের কাজ সেরে ফেলাই ভাল। মনোরঞ্জন অর নো মনোরঞ্জন ডেসপ্যাচ ডকুমেন্টগুলো আজই সব তৈরি করে ফেলতে হবে নয়তো কাল আর কোনও মাল শিপিং হবে না। কোম্পানির ক্ষতি হবে। বড়কর্তা কৈফিয়ত চাইবেন। ইনএফিসিয়েন্সির কোনও ক্ষমা নেই। বছরের শেষে ইনক্রিমেন্ট কমে গেলে কার ক্ষতি হবে! কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পা চলতে শুরু করল।

প্রায় দেড়টা বাজতে চলল।

তার মানে লাঞ্চব্রেক। লাঞ্চের আগে আর কাজে হাত দিয়ে লাভ নেই। মনোরঞ্জনের অসহায় চেহারাটা চোখের সামনে ভাসছে। ঘাড়টা একদিকে কাত হয়ে নড়নড় নড়ছে। ঠোঁট দুটো ফাঁক। সারা মুখে কে যেন আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে। হার্ট সম্বন্ধে বেশ হুঁশিয়ার হবে। বলা যায় না, কখন কী হয়? বেশি দুশ্চিন্তা করা চলবে না। খাওয়া-দাওয়ায় ফ্যাটের অংশ কমাতে হবে। আরও বেশি কায়িক পরিশ্রম করতে হবে। কোনওটাই খুব শক্ত নয়। তবু মানছে কে?

অমল এসে সামনে দাঁড়াল।

কী দাদা চলুন, লাঞ্চে যাই। কী ভাবছেন অত?

BANGLADARSHAN.COM

–চল যাই। না, তেমন কিছু ভাবছি না। হার্টের অসুখ খুব হচ্ছে। ছেলে-বুড়ো কাউকেই বাদ দিচ্ছে না।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালুম। ক্যান্টিন ফার্স্ট ফ্লোরে।

–চক্রবর্তী সাহেব আপনার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। সেই কারণেই আপনাকে বোধ হয় এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

লিফ্‌টে নামতে নামতে অমল এই একটা কথাই বলতে পারল। মনোরঞ্জন আমার বন্ধু ছিল ঠিকই, তবে সে অনেক আগে ছাত্রজীবনে। বড়লোকের ছেলে। ছাত্রদের তো কোনও জাত থাকে না, তাই তখন মেলামেশায় কোনও বাধা ছিল না। চাকরি জীবনে সে আমার দু তিন ধাপ উঁচুতে, প্রায় ডিরেক্টরদের কাছাকাছি। অফিসে আমরা একটু দূরত্ব বজায় রেখেই চলতুল; কারণ সেইটাই ছিল শোভনীয়।

ক্যান্টিনে লাঞ্চের সময় সকলকেই প্রায় পাওয়া যায়। রথী-মহারথী থেকে চুনোপুঁটি সবাই। কাঁটা চামচ, ছুরি প্লেটে প্লেটে নাচতে থাকে। টেবিলের কানায় কানায় রং-বেরঙের টাই দুলছে। হাতে হাতে পার করা রুমাল মাঝেমাঝে আলতো আলগোছে ঠোঁট থেকে লালা কিংবা সসের উদ্ধৃত অংশ মুছে নিচ্ছে। ইংরেজি আর বাংলার ফুটফাট খই ফুটছে।

ওই কোণে জানালার ধারে, জোড়া টেবিলে মনোরঞ্জনের স্টেনো হেসে হেসে সান্যালের সঙ্গে খুব গল্প করছেন। ভদ্রমহিলা আজকাল সান্যালের সঙ্গে খুবই যেন মাখো মাখো হয়ে উঠেছেন। অফিসে এই একটা গুরুতর ঘটনা

ঘটে গেল, আজকের দিনটা অন্তত হাসাহাসি না করলেই ভাল হতো। যতই হোক মনোরঞ্জন ছিল 'ইমিজিয়েট বস।' জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে একটা মানুষের টানাপোড়েন চলছে আর ওরা সামনে মুরগির ঠ্যাং রেখে রঙ্গ রসিকতা করছে। মানুষ সত্যি অত্যাশ্চর্য জীব! সমাজে বাস করতে হলে অনেক সময় একটু আধটু মুখোশ পরে চলতে হয়।

হাসাহাসি করতে করতে এক সময় আমার দিকে চোখ পড়তেই একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেল। হঠাৎ দেখি চেয়ার ছেড়ে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। কী হল আবার? দেবী কি আমায় ভর করবেন। মনে হচ্ছে সেই রকমই। আগে আগে ভেসে আসছে বেশ দামি সেন্টের গন্ধ। সামনের চেয়ারে বসে মিস ঘোষ বললেন, আপনাকে একটা কথা জানাতে এলুম।

—বলুন কী কথা?

—সকাল থেকে দেখলাম অনেককেই খবর দেওয়ার চেষ্টা হল: কিন্তু ওঁর বাবাকে একবার খবর দিলে হতো না? বৃদ্ধ মানুষ আর ওই একমাত্র ছেলে!

—কিন্তু, আমি যতদূর জানি, দুজনেরই দীর্ঘ দিনের ছাড়াছাড়ি। কী একটা ব্যাপারে পিতাপুত্রে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। সে ক্ষেত্রে...

BANGLADARSHAN.COM

—তাতে কী হয়েছে? ছেলের অসুস্থতার খবর বাবাকে জানাতে হবে না?

—এ সব বিলিতি প্রতিষ্ঠান। বউ ছাড়া আমাদের আর কেউ থাকতে পারে, তা এঁরা মনে করেন না।

—প্রতিষ্ঠান যাই মনে করুক, আপনারা কী মনে করেন?

—এখানে আমার একলার মত খাটানো উচিত হবে কি?

—দেখুন আমার যা মনে হল আপনাকে জানালাম। বন্ধু হিসেবে আপনার যদি কিছু করার থাকে করবেন।

মিস ঘোষ যেন একটু রেগেই চলে গেলেন। ভদ্রমহিলার চেহারার বেশ একটা বাঁধুনি আছে। স্পিরিটেড, তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। হাসলেও ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে ভাবনা চলেছে।

বিয়ের পরই মনোরঞ্জন বাড়িছাড়া। পদ্মপুকুরের অত বড় বাড়ি ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে কোম্পানির দেওয়া কোয়ার্টারেই থাকে। ব্যাপারটা ভাবতেও কেমন লাগে; কিন্তু এইটা তো জীবনের সত্য, যেমন সত্য মনোরঞ্জনের হঠাৎ অসুস্থ হওয়া। থাকগে। কে এখন মনোরঞ্জনের বাবারে খবর দেবে!

তিনটে নাগাদ অনিমেষ নার্সিংহোম থেকে ফিরে এল। ফিরে এসেই সোজা ডিরেক্টারের ঘরে ঢুকে গেল। কানাঘুষোয় শুনলুম, মনোরঞ্জনের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। সেরিব্র্যাল অ্যাটাক। ডাক্তাররা সন্দেহ করছেন, বাঁচলেও একটা দিক হয়তো পঙ্গু হয়ে যাবে।

বিকেলের চা খেতে খেতে বিস্তারিত সব শুনলুম। কিন্তু ব্যাপারটা মনোরঞ্জনের এতই ব্যক্তিগত যে মনে সামান্য রেখাপাত করেই সরে গেল। আমি হঠাৎ নিউ মার্কেটের কথা ভাবতে শুরু করলুম। ছুটির পর কিছু কেনাকাটার জন্যে সুলেখাকে আসতে বলেছি। প্যারালিসিস বড় বিশ্রী ব্যাপার। ভয়ানক পরনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। চা খেলে হার্টের কিছু হয় না তো! বড়বাবু ফাইল সই করাতে এসেছিলেন, জিজ্ঞেস করলুম। বললেন, না না চায়ে স্যার কফিন আছে। হার্টের পক্ষে বরং ভালই।

কথাটা শুনে খুশি হয়ে সই করে দিলুম। অন্য সময় হলে ভদ্রলোককে একটু ন্যাজে খেলাতুম। নিজের পার্টিকে এত টাকার একটা কাজ দিচ্ছেন! মেয়েরে বিয়ে দেবেন সামনের মাসে। টাকার দরকার। মেয়েটি দেখতে শুনতে বেশ ভালই। একবার কী একটা ফাংশানে পরিচয় হয়েছিল। ভাল লেগেছিল। ফাইলটা সই করাবার সময় মেয়েটি তার সেই সিল্কের শাড়ি জড়ানো সুস্পষ্ট চেহারা নিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল।

চারটে নাগাদ পরেশ একটা অর্ডারের কপি নিয়ে ঘরে ঢুকল। অনিমেষ চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কাজ চালাবে অর্ডারটা পড়ে মনোরঞ্জনের ওপর ভীষণ রাগ হল। কে বলেছিল তাকে হঠাৎ অসুস্থ হতে! অফিস স্টেআপের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎই এই ধরনের পরিবর্তন এলে মনের ব্যালেন্স ভেঙে পড়ে। এক ধরনের হিংসেতে মন পুড়ে যেতে থাকে। সে দিনের ছেলে অনিমেষ, একটা হামব্যাগ চরিত্রহীনই বলা চলে, কেরিয়ারে তেজি ঘোড়ায় চেপে কেমন টগবগ দৌড়চ্ছে!

BANGLADARSHAN.COM

হঠাৎ মনে হল মনোরঞ্জনও একটা ঘোড়া। ওকে চাঙ্গা করে তোলাটাই যেন আমার একটা বাজি জেতা। তা না হলে রেসে একটা ঘোড়াই বাজিমাত করে বেরিয়ে যাবে। অনিমেষের সঙ্গে দৌড়বার ক্ষমতা একমাত্র মনোরঞ্জনেরই ছিল। মনোরঞ্জনকে দেখতে যাওয়ার ভীষণ একটা তাগিদ ভেতর থেকে ঠেলতে লাগল। যে তাগিদ এই অর্ডারটা হাতে পাওয়ার আগে আমার ছিল না। নিজের চোখে একবার দেখতে হবে, সে সারবে কি না! যেমন করেই হোক তাকে সারাতে হবে।

অনেকেই দেখলুম অনিমেষকে কনগ্র্যাচুলেশন জানাতে ছুটছে। কাপ কাপ কফি চলেছে। যেন একটা মহোৎসব? কারুর সর্বনাশ কারুর পৌষ মাস। যতই হোক বড় কর্তা। খারাপ লাগলেও একবার যেতে হল। এর মধ্যেই বেশ চিফ চিফ ভাব এসে গেছে। একটু লাজুক লাজুক হাসি? এ তো সাময়িক পদোন্নতি ভাই। ঈশ্বর করুন, মনোরঞ্জন সুস্থ হয়ে এসে তার চেয়ার দখল করুক। কী যে বলেন? মনোরঞ্জন জন্মের মতো ফিনিশ। এ চেয়ার আপনারই পাকা হবে। অ্যান্ড ইউ রিজার্ভ ইট। এ চেয়ার সুটেবল ফর দি ম্যান। না না এ ম্যান সুটেবল ফর দি চেয়ার। কনগ্র্যাচুলেশন মিস্টার তরফদার। এক কাপ কফি মেরে নিজের ঘরে। ফোনে সুলেখাকে জানিয়ে দিলুম, একনার নার্সিংহোমে যাব। আজ তোমার মার্কেটিং থাক।

রাস্তায় নেমেই পশ্চিম আকাশে চোখে পড়ল? বেশ সমারোহ করে সূর্য ডুবতে বসেছে। বিদায়ের সময়েও কত তোমার ঘটা। একটা ট্যাক্সি ছাড়া নার্সিংহোম যাওয়া যাবে না। অন্য কোনও যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। একটা দুটো ট্যাক্সি যাচ্ছে। সব ভর্তি। একটা ফাঁকা ছিল। মিটার-ফ্ল্যাগ লাগানো। কিছুতেই থামল না। আধঘণ্টা নাচানাচি

করে, মনোরঞ্জনকে দেখতে যাওয়ার উৎসাহে ভাটা পড়ল। মনোরঞ্জনের চেয়ারে অনিমেষকে তেমন বেমানান লাগল না। চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়েছে হোক। আমার কী? আমি তো আর হতুম না। চেষ্টা করলেও হতো না। আমার সে যোগ্যতা নেই।

হাঁটতে হাঁটতে স্ট্যান্ড রোড ধরে, গঙ্গাকে বাঁয়ে রেখে ফোর্টের দিকে যেতে যেতে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। জীবন তখন কত সবুজ ছিল। চোখ কত নীল ছিল। সেই জীবনটাকে যদি আবার ফিরে পেতুম। এখন যেন একটা বকাটে ছেলের হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছি। অপবিত্র একটা কিছুকে যেন বাহারি মোড়কে মুড়েছি।

এ দিকে আমার উদ্দেশ্যেই ছিল একটা বেঞ্চিতে দু দণ্ড বসে মনটাকে একটু জুড়িয়ে নেব। বড় জ্বলছে। আমার নিজের স্বপ্ন সব অন্যের জীবনে পূর্ণ হচ্ছে। মনোরঞ্জন বন্ধু ছিল। মাঝে-মধ্যে আবদার করলে একটু-আধটু সুযোগ সুবিধে দিত। আমার খোঁটে নড়ে গেল। এখন অনিমেষের যারা পেটোয়া, তাদেরই বোলবালা চলবে। এই হয়। কিং ইজ ডেড, লং লিভ দি কিং।

ওয়াটার গেটের কাছাকাছি এসে দেখলুম একটা ক্রিমরঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারের সিটে বসে আছেন এক ভদ্রমহিলা। ববচুল। পেছন থেকে দেখলেও চেনা চেনা মনে হল। গাড়িটার দিকে আর একটু এগোলুম। ফিগারটা এবার স্পষ্ট হল। একটু অবাকই হলুম। মনোরঞ্জনের স্ত্রীকে এখন এখানে দেখব, স্বপ্নেও ভাবিনি। দু-একবার পার্টিতে দেখেছি। চিনতে ভুল হয়নি। কাছে এগিয়ে গেলুম।

BANGLADARSHAN.COM

—মিসেস চক্রবর্তী আপনি?

ভদ্রমহিলা প্রথমে এমনভাবে তাকালেন, যেন দেখেও দেখছেন না। পরে চিনতে পারলেন। তখন আমি বললুম, শুনেছেন তো, মনোরঞ্জন?

—হাঁ, দেখেও এলুম।

—এখানে একা একা মন খারাপ করে কী করবেন? মানুষের তো কোনও হাত নেই।

—না না, মন খারাপের কী আছে? অসুখ-বিসুখ তো মানুষকে তাড়া করবেই। পৃথিবীতে বাঁচা মানেই সব রকমের সম্ভাবনার জন্যে প্রস্তুত থাকা।

—তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কি একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে? মনটাকে একটু ফ্রেশ করে নেওয়ার জন্যে!

—না না, ফ্রেশ-ট্রেশ নয়। আমার কি এত সময় আছে? আটকে পড়েছি। আমার এখন দুটো সমস্যা। প্রথম সমস্যা, গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। সঙ্গে আমার স্কুলের একটি ছেলে ছিল। তাকে পাঠিয়েছি, কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে এ এবিতে একটা ফোন করার জন্যে। দ্বিতীয় সমস্যা হল, বাড়ি ফেরার সমস্যা। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের দুটো চাবি। একটা থাকত আমার কাছে আর একটা ওর কাছে। আমার চাবিটা আমি সকালে

কোথায় হারিয়েছি। ওর চাবিটারও কোনও হদিস পাচ্ছি না। ব্যাগে নেই, পকেটে নেই। ও তো কথা বলতে পারছে না। জিগ্যেস করেও উত্তর পাব না। আমাকে একেবারে হেল্‌পলেস করে দিয়েছে। সারারাত কী যে হবে?

—একটা ডুপ্লিকেট চাবির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে তো মুশকিল।

—এই ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন।

—চলুন দেখি কী করা যায়?

—একটু অপেক্ষা করুন গাড়িটা ঠিক হয়ে যাক, তা না হলে যাবেন কী করে? এমন মুশকিলে ফেলল হঠাৎ অসুস্থ হয়ে।

—আমি তো নার্সিংহোমেই যাচ্ছিলুম। ট্যাক্সি পেলুম না বলে যাওয়া হল না।

—ওখানে গিয়ে কোনও লাভ নেই। শুধু শুধু উত্ত্যক্ত করা। এখন যা করার ডাক্তাররাই করবেন। ওর আত্মীয়স্বজনেরা এসে এখন লোক দেখানো উহু, আহা করে পরিবেশটাকে এমন গ্রাম্য করে তুলেছেন, নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা করে আমি তাই চলে এলাম। ধৈর্যই হল সবচেয়ে বড় কথা।

কথায় কথায় পশ্চিমের আলো দপ করে নিবে গেল। আকাশের নীচে ছায়া ছায়া অনেক মানুষ জলের কিনারা ঘেঁষে বসেছে। সবুজ মাঠের এখানে ওখানে ওই রকম সব ছায়া ছায়া জটলা। আমার সামনে এখন তিনটে সমস্যা। গাড়িটা ঠিক হবে। ঠিক হলে মিসেস চক্রবর্তীকে একটু হেল্‌ফ করতে হবে। তারপর সেই দুটো হারানো চাবির বিকল্প আর একটা চাবির ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকা যাবে না। আর ঢুকতে না পারলে ভদ্রতার খাতিরে আমিও বাড়ি ফিরতে পারব না। এই সব ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হল। মনে হল কত যুগ যেন অপেক্ষা করে আছি। ইঁদুরের মতো কলে আটক হয়ে পড়েছি। কখন যে মুক্তি পাব কে জানে! পুরো ব্যাপারটার মধ্যে নিজের কোনও স্বার্থ যদি জড়িয়ে থাকতো তা হলে হয়তো এতটা খারাপ লাগত না।

ঠিক এইসময় মিসেস চক্রবর্তী গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় ডান পা রেখে নামতে চাইলেন। একটা সুডৌল পা বেরিয়ে পড়ল শাড়ির আড়াল থেকে। সিল্কের কাপড়ের আঁচল খসে পড়ল কোলে। একবার মাত্র তাকিয়ে দেখলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, গাড়িতে পেছন ঠেকিয়ে অনির্দিষ্টকাল দাঁড়িয়ে থাকাটা বোধহয় তেমন কষ্টকর নয়।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM